কথাবার্তা আশিস অভিকুন্তক

আশিস অভিকুন্তক ফিল্ম মেকার, স্কুল থেকে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরে, গান্ধীবাদি, আমেরিকায় পড়তে যাবার সুযোগ পেয়ে সেখানে না গিয়ে চলে যায় নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে যোগ দিতে, মেধার ডাকে। এখন পড়ায় আমেরিকায়, ফিল্ম করে নিজের সঞ্চয়ের পয়সায়। তার ফিল্মগুলো যেন এক একটি প্রবন্ধ। রোজ ২ ঘন্টা চরকা কাটে বাড়িতে। এপ্রিল মাসে তার ফিল্ম 'কল্কিমন্থনকথা' দেখার পর,আশিসের জীবন – দর্শন ও সিনেমা নিয়ে কথা হল –সুরজিৎ সেন

যদ্দুর জানি তোমার নাম আশিস চাড্ডা,অভিকুন্তক কোথা থেকে এল?

সেটা লম্বা গল্প। তার আগে বলি,চাড্ডা এমনই একটা পদবী যেটা হিন্দু পাঞ্জাবি, মুসলমান পাঞ্জাবি আর শিখ পাঞ্জাবিদের মধ্যে আছে। আমরা মূলত পাঞ্জাবি ক্ষত্রিয়। আমাদের গোষ্ঠিটি হল খুখরেন গোষ্ঠি। এর হল যোদ্ধা। পাঞ্জাবে আনন্দ, খোলি, সবরিওয়াল,চাড্ডা – এরা সব যোদ্ধার জাত।

তোমরা তাহলে পাঞ্জাব থেকে এসেছ ?

আমাদের আদি নিবাস হল রাওয়ালপিণ্ডির কাছে একটা জায়গা। আমার প্রপিতামহ ১৯১০/১১ সালে মর্দান বলে একটা শহরে চলে যায় যেটা আফগানিস্তান বর্ডারের ১৫ / ২০ কিলোমিটার দূরে। খাইবার পাসের কাছে। ওই শহরটা এক নবাবের অধীনে ছিল। প্রপিতামহ ছিলেন পেশায় আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি চিকিৎসক। নবাব ওকে জায়গা দিল প্র্যাকটিস করবার। ১৯৪৭ সালে উনি ওই অঞ্চলের সব চেয়ে ধনী ও নামকরা ডাক্তার। আবার অ্যালুমুনিয়ামের বাসন

তৈরির ফ্যাক্টরি করেছিলেন, একটা বড় দোকানও ছিল অ্যালুমুনিয়ামের বাসনের। আমার ঠাকুর্দারা অনেক ভাই বোন ছিলেন। ১৯৪৭ সালের মার্চে নবাব তাদের বলে যে এটা পাকিস্তান হয়ে যাবে। তোমারা চলে যাও, আমি বাঁচাতে পারব না। আমার ঠাকুর্দাদের একটা বিশ্বাস ছিল এই সব সাময়িক ব্যাপার, ছয় মাসের মধ্যে সব আবার আগের মতো হয়ে যাবে।

মর্দান থেকে তাঁরা ভারতের পাঞ্জাবে চলে এলেন?

না। ভারতের পাঞ্জাবে ওনারা যানইনি। সামান্য কিছু সঞ্চয় নিয়ে তাঁরা গেলেন জম্মু। প্রপিতামহের শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা ওখানে থাকতেন। ওখানে কিছুদিন থাকার পর সবাই বুঝল যে আর মর্দানে ফিরে যাওয়া যাবে না, ওটা এখন পাকিস্তান। তখন আমার ঠাকুর্দা দেরাদুনে চলে গেলেন। বাবা ওখানে বড় হচ্ছিল, তারপর সবাই উত্তরপ্রদেশের বারেলিতে চলে যায়।

মর্দানের বাড়ি – সম্পত্তি সবই হাতছাড়া হল?

সে তো হলই। ওই মর্দানের বাড়িটা চলে আসবার আগে প্রপিতামহ যাঁকে দিয়ে আসেন উনি ছিলেন খান আব্দুর গফফর খান অর্থাৎ সীমান্ত গান্ধীর যে পার্টি 'খুদাই খিদমতগার' এর স্থানীয় নেতা। সম্প্রতি আমার এক পাকিস্তানি বন্ধু,যে আমেরিকায় থাকে,দেশে গিয়েছিল। সেই সময় একবার মর্দানে গিয়ে আমাদের বাড়ির ছবি তুলে এনেছে। আমারও একবার ইচ্ছে আছে যাবার। যাই হোক, ঠাকুর্দা দেরাদুন থেকে বারেলিতে চলে যায়। ওখানে ওষুধের দোকান খোলে ও ডাক্তারি করে। ঠাকুর্দা আর্য সমাজে যোগ দেয়, সেই মর্দানে থাকতেই ।

দয়ানন্দ সরস্বতী যার প্রতিষ্ঠাতা ?

হ্যাঁ। পশ্চিম পাঞ্জাবে ১৯৩০ সাল নাগাদ আর্য সমাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হয়ে ওঠে। এই যত পাঞ্জাবি ক্ষত্রিয় আছে সব আর্য সমাজের সদস্য হয়ে যায়। তো ঠাকুর্দা বারেলিতে আর্য সমাজের একজন প্রধান নেতা হয়ে ওঠে। ঠাকুরদা বেশ কিছু মুসলমানকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনে।

আর্য সমাজের ওটাই রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা ছিল যে মুসলমানরা যেমন ধর্মান্তরিত করে, আর্য সমাজও কাউন্টার ধর্মান্তরিত করবে ....

কিন্তু আর্য সমাজিরা কখনো হিন্দু মহাসভা বা আর এস এস – এর সঙ্গে যোগ দেয়নি।

তুমি নাকি এই ব্যাণ্ডেল লাইনের শ্রীরামপুরে ছিলে?

বাবা বিড়লা ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে ফার্মেসি নিয়ে পড়েছে। এম এ পাশ করে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করে শেষে শ্রীরামপুর। কোন্নগরে টাটা –ফাইজেন কোম্পানির ওষুধের ফ্যাক্টরি ছিল, বাবা ওখানের ফ্যাক্টরির ম্যানেজার ছিল আর মাকে নিয়ে শ্রীরামপুরে থাকত। ফাইজেন ছিল আমেরিকান কোম্পানি।

আচ্ছা তোমার বাবা তখন বিবাহিত ?

হ্যাঁ। আমার মায়ের বাবারা ছিলেন লাহোরের লোক। ওনারাও উদ্বাস্তু। তো আমার বাবা আর মা দুজনেই ছিন্নমূল পরিবারের মানুষ। আর মায়ের ঠাকুর্দা লাহোরের কুস্তিগির ছিলেন আর ডাক্তারি পড়তেন। মায়ের বাবারও একটা ওষুধের দোকান ছিল। লাহোরে ঘটনাটা হয়েছিল কি ওখানে হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘু, কিন্তু ধনী। হিন্দুরা চেয়েছিল লাহোর ভারতেই থাকবে। জুনের শুরুর দিকে তারাই দাঙ্গায় ইন্ধন দেয়। ১৩ অগস্ট ১৯৪৭,যখন জানা গেল যে লাহোর পাকিস্তানে যাবে, তখন হিন্দুরা পালাতে শুরু করে এবং মুসলমানরা পাল্টা মার দিতে থাকে। আমার মায়ের পরিবার ১৮ অগস্ট ট্রেনে চেপে ভারতে আসে। এসে দিল্লিতে পুরানা কিলায় উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়।পরে কমলানগরে উদ্বাস্তুদের জন্য নেহেরু আবাসন তৈরি করেন। সেখানে এই পরিবার একটি বাড়ি পায়। মায়ের বাবাও যা কিছু সামান্য সঞ্চয় দিয়ে দিল্লির চাঁদনী চকে একটা ওষুধের পাইকরি বিক্রির দোকান দেয়। বারেলি থেকে আমার বাবার বাবা ওই দোকানে ওষুধ কিনতে আসত। ওইভাবেই বাবা – মায়ের বিয়ের ব্যাপারটা ঘটে।

শ্রীরামপুরে কী হল ?

আমার মা যখন প্রেগন্যান্ট তখন আমার বাবা তাকে জম্মুতে আমার জেঠার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কারণ জেঠা আর জেঠিমা সেখানে আর্মি হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। আমি ওখানেই জন্মাই। এরপর মা ফিরে আসে শ্রীরামপুরে। ওই রকম একটা মফস্বলে মা থাকতে চায় না, ১৯৭১ সাল ঘোর নকশাল আমল, মা সারাদিন একা থাকে, বাবা গভীর রাতে ফেরে। চারপাশে বাঙালি, মা একমাত্র পাঞ্জাবি, কোনো বন্ধু নেই। খুন, বোমা, পুলিশি তল্লাশি চারপাশে চলছে। এদিকে বাবাকে নকশালরা থ্রেট করেছে যে লেভি দিতে হবে। সব মিলিয়ে ওনারা বছর দুয়েক ছিলেন ওখানে। তারপর কলকাতায় সাদার্ন অ্যাভিনিউতে চলে যান।

বাবা চাকরি ছেড়ে দিলেন ?

হ্যাঁ। ডেক্সোরেঞ্জ নামে একটি ওষুধের ফ্যাক্টরির ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। ফ্যাক্টরি ছিল তিলজলায়।

ডেক্সোরেঞ্জ ওষুধ হিসেবে খুব জনপ্রিয় ছিল। আমাদের বাড়িতেও দেখেছি। শখের থিয়েটারে রক্ত দেখাতে লাল ডেক্সোরেঞ্জ ব্যবহার হতো

ডেক্সোরেঞ্জ তো রক্ত দিয়েই তৈরি। আয়রন টনিক। পশুর রক্ত দিয়ে তৈরি। বোধহয় বেলেঘাটায়,স্টেট স্লটার হাউসে জবাই করা পশুর লিটার লিটার রক্ত ফ্যাক্টরিতে আসত। সেখানে ওরা পশুর ব্লাড থেকে হিমোগ্লোবিনটা আলাদা করে নিত এবং তার সঙ্গে অরেঞ্জ ফ্লেভার দিয়ে টনিকটা তৈরি হত।

তোমার স্কুল কোথায় হল ?

আর কোথায় ডন বসকো (পার্ক সার্কাস)। অদ্ভুত স্কুল,বাংলা আর হিন্দি ওখানে নিষিদ্ধ। শুধু ইংরেজি চলবে। একদম পোস্ট কলোনিয়াল মডার্ন প্রজা তৈরির কারখানা। বাংলা ভাষাটা আমার আর শেখা হলো না। বলতে পারি কিন্তু পড়তে পারি না। হিন্দিটা অবশ্য দুটোই পারি,তবে বেশ খারাপ। ততদিনে ইংরেজি আন্তর্জাতিক বাজারের ভাষা হয়ে গেছে। পরে এটা এখন ডিজিটাল জগতের ভাষাও হয়ে গেছে। যাই হোক, ওই বাজে স্কুলটাতে পড়তে হল। এমন কুশিক্ষা দিয়েছিল যে এখনো আমাকে সেটা ভুলে যাবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

ওখানেই ১০ বছর পড়লে ?

না। ক্লাস নাইনে ডন বসকো ছেড়ে দিলাম। এর মাঝে হলো কী, জেসুইট খ্রিস্টানরা পূর্ব ভারতে লিডারশিপ প্রোগ্রাম অফ স্টুডেন্ট সার্ভিস(এল টি এস) বলে একটা প্রোজেক্ট চালায়। ১৯৫৯ সালে এটা চালু হয়। এটা মূলত মধ্যবিত্ত ছাত্রদের সোশ্যাল সার্ভিস শেখানোর নেটওয়ার্ক। এই সংগঠনটা জেসুইটদের ছদ্মবেশে মার্কসবাদীরা চালাত। সব মিশনারি স্কুলেই এদের নেটওয়ার্ক ছিল। আমি এখানে যোগ দিলাম ক্লাস নাইনে। একটা মুক্ত শিক্ষার পরিবেশ। বাইবেল, কোরান, গীতা সব পড়তে হল। গ্রামে কাজ করতে যাচ্ছি, মাদার টেরিজার আশ্রমে কাজ করছি, সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের কোর্সের বাইরে পড়াশোনা হচ্ছে। ঢাকুরিয়াতে তখন একটা এন জি ও ছিল নাম সার্ভিস সেন্টার, এখনো আছে। ওখানে ছিলেন অর্ধেন্দুদা। উনি সত্তরের দশকে অস্ট্রেলিয়া যান। সেখানে উনি সাসটেনেবল এগরিকালচার, অর্গানিক ফারমিং ইত্যাদি শিখে এসে এখানে কাজ শুরু করেন। অর্ধেন্দুদার বোধহয় একটা নকশাল অতীতও আছে। ভারতে পরিবেশ নিয়ে যে সব এন জি ও প্রথম কাজ শুরু করে সার্ভিস সেন্টার তাদের মধ্যে অন্যতম। এখন ওদের সংগঠন বিরাট হয়ে গেছে। আমি এল টি এস প্রোগ্রামের মাধ্যমে এদের সঙ্গে যুক্ত হলাম। এরা তখন

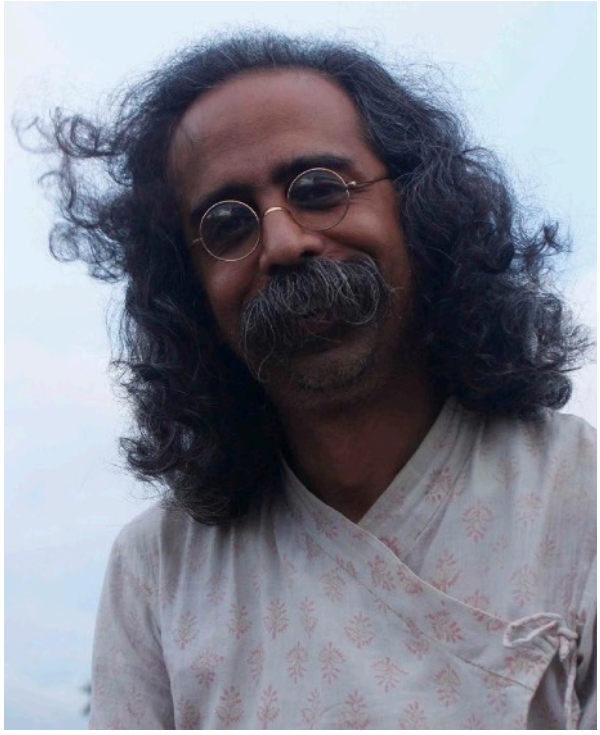

আমার মায়ের বাবারা ছিলেন লাহোরের লোক। ওনারাও উদ্বাস্তু। তো আমার বাবা আর মা দুজনেই ছিন্নমূল পরিবারের মানুষ। আর মায়ের ঠাকুর্দা লাহোরের কুস্তিগির ছিলেন আর ডাক্তারি পড়তেন। মায়ের বাবারও একটা ওষুধের দোকান ছিল। লাহোরে ঘটনাটা হয়েছিল কি ওখানে হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘু, কিন্তু ধনী। হিন্দুরা চেয়েছিল লাহোর ভারতেই থাকবে। জুনের শুরুর দিকে তারাই দাঙ্গায়

সুন্দরবন অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের নিয়ে কাজ করছিল। ওদিকে টমাস কোচারি বলে একজন লিবারেশন থিওলজিস্ট,কেরালার জেসুইট প্রিস্ট, ১৯৮৬ সালে উনি 'সেভ দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাট' আন্দোলন শুরু করছেন, এর আগে ১৯৮৩ সালে সুন্দরলাল বহুগুণা চিপকো আন্দোলন শুরু করেছেন। টমাস কোচারি ন্যাশনাল ফিশ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তৈরি করেন। যাদের শাখা ছিল সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা। চারপাশে এইসব চলছে আর আমি সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কাজ করছি, সব মিলিয়ে আমার সমাজ চেতনাটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। আমি ডন বসকো ছেড়ে হাজরার কাছে ন্যাশনাল হাইস্কুল বলে একটা খারাপ স্কুলে ভর্তি হলাম।

সোশ্যাল ওয়ার্কে জড়িয়ে পড়লে ?

হ্যাঁ, তখন নকশালবাড়ির ইতিহাস পড়ছি। সেই সময় ইভান ইলিচের লেখা একটি বই 'ডিস্কুলিং সোসাইটি' পড়ি। কেউ বলেনি পড়তে,এমনিই লাইব্রেরি থেকে এনেছিলাম। সেখানে উনি বলছেন যদি তুমি তথাকথিত ভালো স্কুলের বাইরে সত্যি কিছু শিখতে চাও, তাহলে খারাপ স্কুলে ভর্তি হও। তাই ন্যাশনাল হাইস্কুলে গেলাম। সকাল ৬ -০০ থেকে ১১ -০০ পর্যন্ত স্কুল চলে,আমি ৯ -০০ টায় স্কুল থেকে বেরিয়ে যাই। কেউ কিছু বলে না। ইলেভেন – টুয়েলভ – এ পড়ার সময় সপ্তাহে ৩ দিন মাদার টেরিজার আশ্রমে কাজ করছি বা সুন্দরবন চলে যাচ্ছি। মাদার টেরিজার ওখানে আমার ১৬ বছর বয়সে আমার কোলেই মানুষ মারা গেছে এরকম অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

তোমার সঙ্গে নাকি মেধা পাটেকরের দেখা হয়েছিল ?

হ্যাঁ। ১৯৯০ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করবে ভারত সরকার তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছিল। সেখানে মেধা এসেছিলেন। তখন মেধার সঙ্গে আলাপ হয়, আমার তখন ১৮ বছর আর মেধার তখন ৩০ বছর বয়স। ওনার কথা আর ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল

হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে কী করলে ?

আর হায়ার সেকেণ্ডারি,একদম পড়াশোনা করিনি। তাই টুকে পরীক্ষা দিয়েছি। টুকতে গিয়ে ধরা পড়েছি, কোনোরকমে ছাড়া পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত ৩৯% পেয়ে পাশ করলাম।

বেশ তারপর কী করলে ?

সেই সময় আমার তিন ধরনের বন্ধু, এরা সব ডন বসকোর, ন্যাশনালে কোনো বন্ধু হয়নি। এক দল আই টি সেক্টরে ঢুকবে বলে তৈরি হচ্ছে, আরেকদল আমেরিকায় যাবে বলে তৈরি হচ্ছে, আরেক দল যারা বড়লোকের ছেলে তারা বি কম পড়বে আর বাবার ব্যবসা দেখবে। আমিও পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমেরিকায় যাবার জন্য। শিকাগোর কাছে ভিসকন্সিতে একটি কলেজে সুযোগ পেয়েছিলাম ভর্তি হবার, স্কলারশিপও পেয়েছি। ওটা ছিল পরিবেশবিদ্যা নিয়ে পড়বার কলেজ। আমার ভিসার অ্যাপ্লিকেশনও হয়ে গেছে। এমন সময় কলকাতায় মেধা পাটেকরের সঙ্গে আবার দেখা। আশ্চর্য আমার নামও মনে রেখেছেন! উনি বললেন, 'কী করছো আশিস' ? আমি বললাম 'আমেরিকাতে পরিবেশবিদ্যা পড়তে যাব'। উনি বললেন, 'আমার ওখানে এস। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের জন্য কাজ কর'।

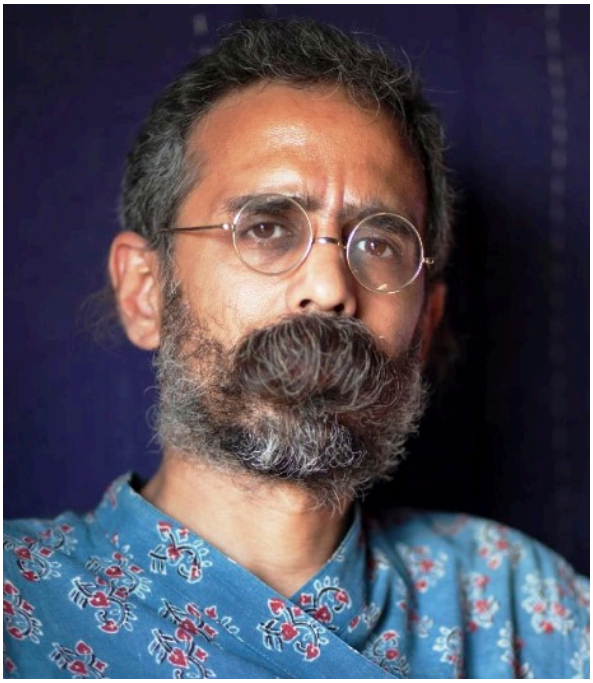

সত্যিই যদি মেধা সেটা করতো তাহলে সেটা ভারতের ইতিহাসে একটা অধ্যায় হয়ে থাকত। ড্যামটা তৈরি হত না। এই সময় আপ নেতা সিনিয়র প্রশান্তভূষণ মেধাকে বলে সুপ্রিম করতে আপিল করতে। মেধা রাজি হলেন। এই ব্যাপারটায় আমি খুব হতাশ হলাম। সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া মানে রাষ্ট্রের শর্তগুলো মেনে নেওয়া। সংগঠনেও ভাঙন ধরল। আনন্দ পটবর্ধন ও আরো কেউ কেউ বলল যে হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া উচিত।

তুমি আমেরিকা না গিয়ে মহারাষ্ট্র চলে গেলে ?

হ্যাঁ। বাড়িতে বাবাকে বললাম। বাবা বলল যে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া চলবে না। পড়াশোনা করে যা খুশি কর। তখন একজন আমাকে বলল বম্বেতে একটি কলেজ আছে যারা সোশ্যাল ওয়ার্কে ব্যাচেলর ডিগ্রি দেয় ওখানে যাও। এটা হল বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক। এই কলেজ থেকে অনেক ছাত্রকে মেধার আন্দোলনে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে পাঠানো হত। ওখানে গিয়ে বললাম মেধা বলেছে ওর কাজে যোগ দিতে আর তার সঙ্গে আমি এই বিষয়টা পড়তে চাই। ব্যাস, ভর্তি হয়ে গেলাম, পরীক্ষাও দিতে হল না । বাবা খুশি কিন্তু মা ভেঙে পড়েছে। ছেলে আমেরিকায় না গিয়ে কী সব করছে।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে যোগ দিলে ?

হ্যাঁ। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টো অবধি কলেজ, তারপর বাকি সময়টা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কাজ। ৩ বছর আমি নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের হোলটাইমার হয়ে কাজ করেছি। ওদের বম্বের অফিসে বসতাম। এই সঙ্গে ওখানকার নকশালদের সঙ্গেও আলাপ হল। বম্বের একটি স্লামে এদের স্টাডি সার্কেলে যেতাম। থাকতাম ওয়াই এম সি এ হস্টেলে, সাউথ বম্বেতে।

বম্বেতে সিনেমা দেখতে না ?

হ্যাঁ। কলকাতায় থাকতে নন্দনে সিনেমা দেখার একটা অভ্যাস ছিল। ওই সোশ্যাল ওয়ার্ক করছি আর সিনেমা দেখছি, পড়াশোনা একদম করছি না। ১৯৯০ তে কলকাতায় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে কিসলস্কির রেট্রোসপেকটিভ দেখি। সাড়ে ১৭ বছর বয়সে কিসলস্কি দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। মানে আমার প্রবল জ্বর এসে গেল।

বম্বেতে কয়েকজন ফিল্ম সোসাইটি অ্যাক্টিভিস্ট এর সঙ্গে আলাপ হল। একটা ফিল্ম ক্লাব ছিল স্ক্রিন ইউনিট বলে। অমৃত গাঙগার আর আশিস রাজাধক্ষ্য এটির প্রতিষ্ঠাতা। এরা মণি কাউল আর কুমার সাহানির ঘনিষ্ঠ ছিল। ওখানে ওঁদের সঙ্গে দেখা হত মাঝে মাঝে। ওই সময় গোদার থেকে তারকভস্কি সবই দেখছি। একটা স্বপ্ন জন্ম নিচ্ছে যে ফিল্ম তৈরি করতে হবে।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কী হল ?

মেধা ওই সময় মহারাষ্ট্র তথা ভারতে একটা আইকনিক ফিগার। আমি ওদের প্রেস নোট লিখতাম। যেটা পরের দিন খবরের কাগজে ছাপা হবে। এছাড়া ওই আন্দোলন করতে গিয়ে মাঝেই মাঝেই মিছিল কী ধর্ণায় বসে গ্রেপ্তার হচ্ছি আর জামিনে ছাড়া পাচ্ছি। এই সময় বম্বেতে যারা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন করছিল আমি তাদের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ি। তখন আমার পিছনে আই বির লোক লেগেছিল। কলেজ আর হস্টেলে আমার সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে বলছে তুমি কী এমন কাজ কর যে পুলিশ এসে তোমার কথা জিজ্ঞেস করে।

সোশ্যাল ওয়ার্কে ডিগ্রি নিয়ে কী করলে ?

ডিগ্রিটা নিয়ে বুঝলাম এটা কোনো কাজেই লাগবে না। জিনিসটা ইন্টেলেকচুয়ালি ডিফাংড। সিদ্ধান্ত নিলাম আর যাই করি না কেন এই সোশ্যাল ওয়ার্কে মাস্টার ডিগ্রি করব না। এই সময়ে রাজনীতির ব্যাপারে আমার মোহভঙ্গ ঘটল। এখনো আমি মনে করি নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন সত্যিই একটা খাঁটি পরিবেশবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন যেটা ভারত সরকারকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল। ওই সময় মেধা বেশ কয়েকবার জলসমর্পণ এর ডাক দিয়েছিল। মানে ড্যামে জল ছাড়লে ওখানেই বসে মৃত্যুবরণ করব। মেধা যতবার জল সমর্পণ এর ডাক দিয়েছে আমি ততবার সেখানে সামিল হয়েছি, সরকার শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছে। মেধা ছিল মূল চালিকা শক্তি। শঙ্কর গুহ নিয়োগী থেকে বিনোদ মিশ্র,গান্ধী সেবাগ্রামের কর্মী থেকে বম্বের বুদ্ধিজীবী সবাইকে একটা মঞ্চে সামিল করেছিল। এই রকম পরস্পর বিপরীত রাজনৈতিক শক্তি একটা মঞ্চে এসেছে, ভারতের ইতিহাসে এরকম হয়নি। ১৯৯৪ সালে মেধা আমরণ অনশনে বসবে বলে ঠিক করে, যতক্ষণ না ভারত সরকার ড্যামের কাজ বন্ধ করছে। সত্যিই যদি মেধা সেটা করতো তাহলে সেটা ভারতের ইতিহাসে একটা অধ্যায় হয়ে থাকত। ড্যামটা তৈরি হত না। এই সময় আপ নেতা সিনিয়র প্রশান্তভূষণ মেধাকে বলে সুপ্রিম করতে আপিল করতে। মেধা রাজি হলেন। এই ব্যাপারটায় আমি খুব হতাশ হলাম। সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া মানে রাষ্ট্রের শর্তগুলো মেনে নেওয়া। সংগঠনেও ভাঙন ধরল। আনন্দ পটবর্ধন ও আরো কেউ কেউ বলল যে হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া উচিত। অনেকে বলছে যে না সুপ্রিম কোর্টে যাব না। আমি এই সময় নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এলাম।

বেরিয়ে এসে কোথায় গেলে ?

তখন ভাবছি সিনেমা তৈরি করব। তাহলে পুণেতে এফ টি আই আইতে যাই। গিয়ে দেখলাম সেই বছর অ্যাডমিশন বন্ধ, কী সব স্ট্রাইক চলছে ছাত্রদের। বম্বের একজন বলেছিল এফটি আই আইতে রোজ সন্ধেবেলা ফিল্ম দেখায়। তুমি ওখানে গিয়ে ফিল্ম দেখ। কেউ কিছু বলবে না। আমি তখন পুণে

ইউনিভার্সিটিতে অ্যানথ্রপলজিতে এম এ তে ভর্তি হতে গেলাম। ওখানে এক অধ্যাপক আমাকে বলেন যে এখানে অ্যানথ্রপলজি ডিপার্টমেন্ট ভাল নয় তুমি ডেকান কলেজে আর্কিওলজিতে ভর্তি হও, ওটা এখানে

খুব ভালো পড়ানো হয়।আমার বন্ধু পড়ায় আমি তোমার কথা বলব। আমি বললাম যে, আর্কিওলজি পড়তে অসুবিধে হবে। উনি বললেন যে, হবে না। দুটো বিষয়ের তফাত হল অ্যানথ্রপলজি জীবিত মানুষ নিয়ে কাজ করে এবং আর্কিওলজি মৃত মানুষ নিয়ে কাজ করে, এ নিয়ে তোমার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এর উত্তরে আমি কিছুই বলতে পারলাম না।

সোশ্যাল ওয়ার্ক থেকে অ্যানথ্রোপলজি থেকে আর্কিওলজি!

হ্যাঁ। পুণের ডেকান কলেজে, যেটা তখন ডিমড ইউনিভার্সিটি, দুটো ডিপার্টমেন্ট লিঙ্গুইস্টিকস আর আর্কিও লজি। দুটোরই খুব ভাল ফ্যাকাল্টি। ওখানে আর্কিওলজিতে ভর্তি হলাম। মাত্র ১২ জন স্টুডেন্ট। অধ্যাপকরা অসাধারণ, অনেকেই বিদেশ থেকে পড়ে এসেছেন। ডেকান কলেজ শহরের একদিকে আর এফ টি আই আই শহরের অন্যদিকে ১০ কিলোমিটার দূরে । সকালে কলেজে পড়ি আর সন্ধেবেলা এফ টি আই আই তে সিনেমা দেখি, ওদের ক্যান্টিনে রাতের খাবার খেয়ে হস্টেলে ফিরতাম। একটা সাইকেল কিনে রোজ ২০ কিলোমিটার আপ ডাউন করি। দুবছর এটা চলল। সারা পৃথিবীর সিনেমার সঙ্গে পরিচয় হল। এফ টি আই আই তে বেশ কিছু বন্ধুও হল। ক্যামেরাম্যান শীর্ষ আর সেতু এদেরমধ্যে ছিল। শীর্ষ তো কলকাতায় কাজ করে। সেতু সম্প্রতি 'দঙ্গল' এর ক্যামেরা করেছে।

এবার ঠিক করলে ফিল্ম করতে হবে ?

হ্যাঁ। আমি তখন ঠিক করেছি যে ফিল্ম করব। ১৯৯৫ সালে আমি প্রথম ফিল্ম করি। একজন মানুষ নগ্ন হয়ে ধূ ধূ প্রান্তরের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পুণেতে আর্মির একটা ট্যাঙ্ক টেস্টিং রেঞ্জ ছিল । বিরাট ফাঁকা প্রান্তর। যে দিন টেস্টিং হয় না, ওরকম দিন দেখে আমরা শ্যুট করলাম। গাড়ি নিয়ে সোজা অনেকটা ভেতরে গিয়ে শ্যুট করেছিলাম। আমার একজন ডান্সার বন্ধু অভিনয় করেছিল। ১৬ মিলিমিটার ফিল্মে শ্যুট করেছিলাম, শঙ্কর রমন বলে একজন ক্যামেরা করেছিল। এইভাবে শুরু হল ফিল্ম তৈরি।

শুরুতে যে প্রশ্নটা করেছিলাম যে অভিকুন্তক কোথা থেকে এল ?

১৯৯২ সালে সিনেমা দেখছি, রাজনৈতিক কাজ করছি, কিন্তু বাজে কবিতাও তো লিখতে হবে। আর প্রেমও করতে হবে। ইংরেজিতে কবিতা লিখতাম, সেগুলো খুব খারাপ। তখন আমি ভাবলাম আশিস চাড্ডার পক্ষে কবিতা লেখা সম্ভব নয়। তাই অভিকুন্তক পদবীটা নিলাম। তখন আমি 'অভিকুন্তক' শব্দটির অর্থও জানতাম না। শব্দটা মনে এল, ভাল লাগল, ব্যবহার করতে শুরু করলাম। বছর দশেক পর এক সংস্কৃতর অধ্যাপিকার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় তিনি আমাকে বলেন, যে, এর অর্থ হল 'যে কাউকে আঘাত করে না'।

প্রথম ফিল্মটা শেষ করে কী করলে ?

এম এ ডিগ্রীটা শেষ করলাম। টাকা নেই ফিল্ম বানাবার। তখন একটা ১৬ মিলিমিটার ফিল্মের ক্যান কিনে একটা শর্টে একটা ফিল্ম করলাম, কোনো রকম এডিট ছাড়াই। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ৭ টা ১৬ মিলিমিটারের ক্যান কিনে ৭ টা শর্ট ফিল্ম করেছি। ৭ টা ফিল্মই ১১ মিনিটের এবং একটাই শর্ট নেওয়া হয়েছে সব ফিল্মে। এর মধ্যে ৪তে ফিল্মকে নাম দিলাম 'এটসেটরা'। প্রথম 'সলিলকি',একজন নগ্ন হয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি ছিল একজন ছেলের মাথা কামানো হচ্ছে। তৃতীয়টি হল, হাওড়া ব্রিজের নীচে একজন রিক্সাওয়ালা রিক্সাটা পারে রেখে গঙ্গায় ডুব দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। চতুর্থটি ছিল পার্ক স্ট্রিট কবরখানায় একজন হেঁটে বেড়াচ্ছে। বাকি তিনটে ফিল্ম আমার অন্য ফিল্মে ব্যবহার করেছি। একটি হল আমার এক বন্ধুর বাড়ি কালীপুজোয় পাঁঠা বলির অনুষ্ঠান। কিন্তু তিন মিনিট শ্যুট করার পর ভাল লাগেনি, বন্ধ করে দিয়েছি। আরেকটি হল বম্বের ফ্যাশন স্ট্রিট। পুরো রাস্তাটা শ্যুট করা হল।

বম্বেতে এসে ফিল্মের কাজ করতে শুরু করলে ?

পুনে থেকে বম্বেতে ফিরে এসে ধারাবির বস্তিতে একটি ঘর নিয়ে থাকতে শুরু করি। সাড়ে তিন বছর ধারাবিতে থেকেছি। বিজ্ঞাপনের ছবির কাজ করব বলে কয়েকটা কোম্পানিতে গেলাম, বুঝলাম আমার দ্বারা হবে না। হঠাৎ আমি একটা প্রোজেক্ট পেলাম মহারাষ্ট্রের আদিবাসীদের লোককথা আর মুখের কথার ইতিহাস ডকুমেন্ট করার। আমার এক বন্ধু কাজ দিয়েছিল। আমি টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করতাম ওদের কথা আর গল্প। দেড় বছর এই প্রোজেক্ট চলল। এরপর আমি একজন পার্সি ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকারের কাছে কাজ চাইতে গেলাম। উনি বললেন যে তুমি আর্কিওলজি পড়েছ, ধুতি – পাঞ্জাবি পরে থাকো সব সময়। তুমি বাস্তু কনসালটেন্ট এর কাজ কর। বাস্তু বিশেষজ্ঞর কাজ করতে লাগলাম। যেহেতু আমি আর্কিওলজি পড়েছি, তাই আর্কিটেকচার আর এথনোলজির বিষয়ে জানা ছিল। ওনার কাছে ছয় মাস

অ্যাসিসটেন্ট হয়ে কাজ করে, তারপর নিজেই কাজ শুরু করলাম। ওই পার্সি ভদ্রলোক আমার কাছে ক্লায়েন্ট পাঠাতেন। ওই সময় বম্বেতে বাস্তু ইজ আ বিগ থিং। প্রচুর বিল্ডিং হচ্ছে। ৩ বছর এই কাজ করেছিলাম। ফ্ল্যাট আর বাড়ি নিয়ে প্রায় ৮০ টা কাজ করেছি। যে টাকা রোজগার করলাম, তাতে ফিল্ম তৈরির টাকা এসে গেল। আর সেই সময় রাজনীতি বলতে এনরন (যারা পারমাণবিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছিল) বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম।

বিদেশে কবে গেলে ?

সেটাও লম্বা গল্প। বম্বেতে আলাপ হল অশ্বিনীর সঙ্গে (আমার প্রাক্তন স্ত্রী)। অশ্বিনী দেও। মারাঠি ব্রাহ্মণ। আলাপ হল এবং প্রেমও হল। ও পড়াশোনায় খুব ভাল। আমি ৩৯ % আর ও হল ৯৩%। মানে স্কুল থেকেই ওরকম নম্বর পেয়ে আসছে এম এ পর্যন্ত। অশ্বিনী সোশ্যাল ওয়ার্কে বি এ করে খুব হতাশ। ওকে তখন বললাম ডেকান কলেজে লিঙ্গুইস্টিকস নিয়ে এম এ করতে। ও গেল পুণেতে আর আমি বম্বেতে, তবে নিয়মিত যাতায়াত করতাম। ও লিঙ্গুইস্টিকস আর সংস্কৃত (পাণিনির ব্যাকরণে) দুটোতেই এম এ করল, গোল্ড মেডেল পেল। তারপর পি এইচডি করল। আর ডেকান কলেজেই সংস্কৃত অভিধান লেখার একটা প্রোজেক্টে যোগ দিল। সেখানে কিছুদিন কাজ করবার পর অশ্বিনী সংস্কৃত নিয়ে গবেষণা স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ পেল। আমরা বিয়ে করে নিলাম। ওর তখন ২২ আর আমার ২৬ বছর বয়স। আমি ধারাবির বস্তি ছেড়ে চলে গেলাম আমেরিকা।

অশ্বিনী তো গবেষণা করল তুমি কী করলে ?

আমেরিকা যাবার আগে আমি সবে শেষ করেছি আমার আরেকটি ফিল্ম 'কালিঘাট অতিকথা'। আমেরিকাতে আমি গেলাম মূলত হাউস হাজব্যান্ড হিসেবে। রান্না করা ঘর গৃহস্থলী দেখা আমার কাজ। তবে আমেরিকাতে একটা মিরাকল হল। ডেকান কলেজে আর্কিওলজির যে প্রফেসর ছিল, উনি ই এন হডার এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আর হডার আর্কিওলজির জগতে একজন পৃথিবী বিখ্যাত তাত্ত্বিক। হডারকে আর্কিওলজির ফুকো বলা হয়। আমি যে বছর অশ্বিনীর সঙ্গে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছি সেই বছরই হডারও ওখানে যোগ দিচ্ছেন, ২২ বছর কেমব্রিজে পড়ানোর পর। আমি শুনে অবাক। আমার ডেকান কলেজের প্রফেসর হডারকে একটা চিঠি লিখে দিলেন। আমি গিয়ে দেখা করলাম। উনি বললেন,তুমি পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই কর। আমি অ্যাপ্লাই করলাম এবং চান্স পেয়ে গেলাম স্ট্যানফোর্ডে। এটা আমার জীবনে একটা মিরাকল। ৬ বছরের জন্য বছরে ১৩ হাজার ডলারের স্কলারশিপ আমি ভাবতে পারিনি। আমি খুশি যে টাকা বাঁচিয়ে ফিল্ম করতে পারব।

পিএইচডি করে কী করলে ?

পিএইচডি করলাম আর আমার প্রথম ফিচার ফিল্ম 'নিরাকার ছায়া' শেষ করলাম। এই ফিল্মটা ৩৫ মিলিমিটারে করেছিলাম। ওদিকে পিএইচডি করলাম এথনোগ্রাফি অফ আর্কিওলজি। দু'বছর কাজ করলাম রাজস্থান, গুজরাত আর হরিয়ানাতে কাজ করলাম। এরপর অশ্বিনী ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে চাকরি পায়, আমিও ওখানে চলে যাই। ততদিনে মেয়ে হয়েছে আমাদের।

ইয়েলে তুমি কি আবার হাউস হ্যাজব্যান্ড ?

না, এবারেও লাক। ওখানে আমি লেকচারারশিপ পেলাম। ইন্ডিয়ান সিনেমা, ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি আর ইন্ডিয়ান অ্যানথ্রোপলজি পড়াতাম। যদিও হডারের আন্ডারে পি এইচ ডি করেছি বলে অনেকে পছন্দ করত না। কারণ হডারকে বেশির ভাগ আমেরিকান তাত্ত্বিকরা পছন্দ করত না। আমি হডারের দ্বিতীয় ছাত্র আমেরিকায়। আমি তিন ধরনের ইন্ডিয়ান সিনেমা পড়াতাম, বলিউড, ডকুমেণ্টারি আর আর্ট ফিল্ম। আমার পড়ানোর কোনও ট্রেনিং ছিল না। শুধু ফিল্মের প্রতি ভালোবাসা থেকে পড়িয়েছি। ৩ বছর পড়ানোর পরও চাকরি পাচ্ছি না। কারণ হডারের ছাত্র । তখন একজন আমাকে বলল, তুমি ফিল্ম স্টাডিজে পড়ানোর চাকরি খোঁজ। একটা অদ্ভুত চাকরি পেলাম বোস্টনের কাছে রোড আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে। ওরা এমন একজনকে খুঁজছিল যে ফিল্ম করেছে এবং পড়াতেও পারবে। ১৭৫ জন এই চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল, আমি পেয়ে গেলাম, লটারির মতো ব্যাপার। পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে

আমাকে নেওয়া হল কেন ? ওরা বলল আর কারোর ফিচার ফিল্ম করার অভিজ্ঞতা ছিল না, তোমার একটা ফিচার ফিল্ম আছে তাই নেওয়া হল। এছাড়া তুমি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি করেছ।

তুমি বাঙালি নও,অথচ তোমার পোশাক বাঙালির ধুতি –পাঞ্জাবি। এই ব্যাপারটা কী?

ডন বসকোতে পড়তে গিয়ে বুঝলাম এমনভাবে আমাকে তৈরি করা হচ্ছে যাতে আমার মনে দেশীয় ঐতিহ্য আর দেশীয় ভাষা সম্পর্কে একটা ঘৃণা জন্মায়। তখন আমার মনে হয় এটার বিরোধিতা করা দরকার। কিন্তু কী ভাবে? যখন সার্ভিস সেন্টারে কাজ করতাম দেখলাম ওদের কাজের ফ্রেম ওয়ার্কটা

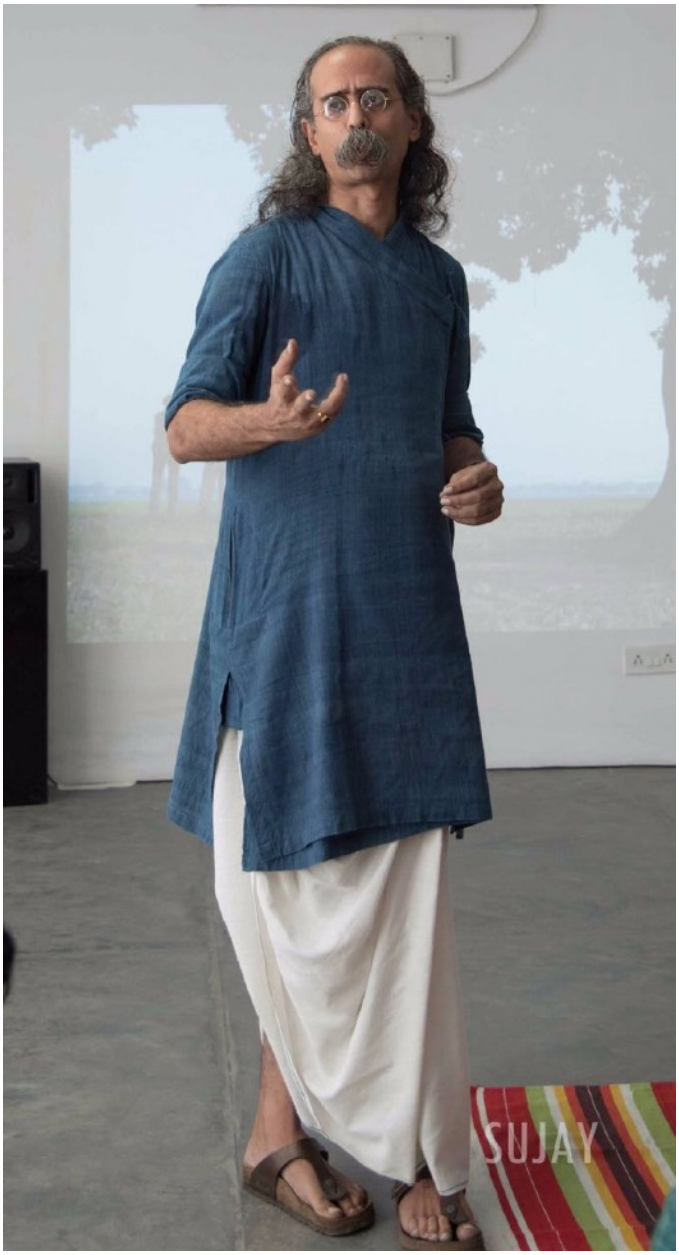

অনেক যুক্তির লড়াই করে ধুতি পাঞ্জাবিতে টিকে থাকলাম। এটাই আমার পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট। এবং এই আধুনিকতা আমাদের কী ক্ষতি করতে পারে সেটা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন। এই হল ধুতি পাঞ্জাবি পড়ার রাজনীতি।

গান্ধীর দেখানো পথ ধরে চলার চেষ্টা করে। এই সময় আমি গান্ধীর 'হিন্দ স্বরাজ' বইটা পড়ি। গান্ধীর দর্শন উপলব্ধি করে ১৬ বছর বয়স থেকে ধুতি পাঞ্জাবি পরা অভ্যাস করতে শুরু করলাম। মা প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে শুরু করল। অনেক যুক্তির লড়াই করে ধুতি পাঞ্জাবিতে টিকে থাকলাম। এটাই আমার পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট। এবং এই আধুনিকতা আমাদের কী ক্ষতি করতে পারে সেটা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন। এই হল ধুতি পাঞ্জাবি পড়ার রাজনীতি।

আবার তুমি বাংলা বলতে পার কিন্তু পড়তে পার না। কিন্তু তোমার ফিল্মের ভাষা বাংলা। এটাই বা কেন?

আমি বাংলা পড়তে পারি খুব কষ্ট করে। অনেক সময় লাগে। ফিল্মের ভাষা বাংলা ..... দেখ,আমি নিজেকে বহুভাষী মানুষ হিসেবে দেখি। আমার মাতৃভাষা পাঞ্জাবি, কিন্তু সেটা আমার বাবা মা আমকে শেখায়নি। কলকাতায় বড় হয়েছি, তাই বাংলা কিছুটা জানতেই হয়েছে। বেশির ভাগ বন্ধুরা বাঙালি। আমিও তো সেই অর্থে ছিন্নমূল। কলকাতায় একজন আউটসাইডার হিসেবেই বড় হয়েছি। আমেরিকায়, পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে সর্বত্র আমি আউটসাইডার। কিন্তু আমাকে কোথাও একটা শিকড় ছড়াতে হবে,সেটা হল কলকাতা। সত্যজিত রায় বা ঋত্বিক ঘটকের ছবি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। আমার ভালোবাসার ভাষা বাংলা আর বুদ্ধিবৃত্তির ভাষা ইংরেজি। তাই আমার ভালোবাসার আর্ট ফর্মের ভাষাও বাংলা। আমার ফিল্ম ইউনিটের যারা আছে আমার অভিনেতারা সবাই বাঙালি। আশা করি বোঝানো গেছে।

তোমার ঘরে একটি চরকা আছে। চরকা কী

কাজে লাগে ?

এটা লম্বা কাহিনি, ছোটো করে বলছি। যখন মেধা পাটেকরের সঙ্গে কাজ করছি তখন পরিবেশ সচেতনতা দিয়ে সব কিছু বুঝতে চেষ্টা করছি। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ছিল মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। আর আশ্চর্য, আমি দেখেছি, একই মিটিঙে শঙ্কর গুহ নিয়োগী, বিনোদ মিশ্র আর গান্ধী সেবাশ্রমের প্রতিনিধিও আছে। গান্ধীবাদের প্রতি আমার ঝোঁক ছোটো থেকে। ক্লাস নাইন থেকে আমি খাদির জামা – কাপড় পরতে শুরু করি। স্কুল ইউনিফর্ম পড়তাম না। গান্ধীজি চরকাকে রাজনৈতিক প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। আমি মনে করি চরকা এখন পরিবেশ সচেতনতার প্রতীক। তুমি যে জিন্স আর টি শার্ট পরেছ, সেটা তৈরি করতে অনেক ইলেকট্রিসিটি পুড়েছে। কিন্তু আমি যে খাদির ধুতি –পাঞ্জাবি পরে আছি, সেটা তৈরি করতে প্রায় জিরো ইলেকট্রিসিটি পুড়েছে। এখন যে সময়ে আমরা বাস করছি, সেখানে পরিবেশকে বাঁচাতেই হবে। এটা আর পছন্দ – অপছন্দের জায়গায় নেই। এটা এখন অনিবার্য যে পরিবেশকে বাঁচাতে হবে। তো খাদি পরা মনে এখন পরিবেশ সচেতনতার প্রচার। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসর পর বম্বেতে দাঙ্গা হয়। ১৮ বা ২০ ডিসেম্বর একটা শান্তি মিছিল হয়েছিল। ওই মিছিলে আমি হেঁটে ছিলাম, হেঁটেছিলেন প্রবীণ গান্ধীবাদী সর্বোদয় নেতা ঠাকুরদাস বাও। ওনার বয়স তখন ৭৫। শান্তি মিছিল শেষে একটা সভা হচ্ছিল রাস্তায়। আমি দেখলাম রাস্তার এক কোনে বসে ঠাকুরদাস চরকায় সুতো কাটছেন। আমি ওনার পাশেয় বসে পড়লাম। ওনার কাছ থেকে জানলাম বম্বেতে মহাত্মা গান্ধী যেখানে থাকতেন সেখানে চরকা শেখানোর ক্লাস হয়। আমি ওই

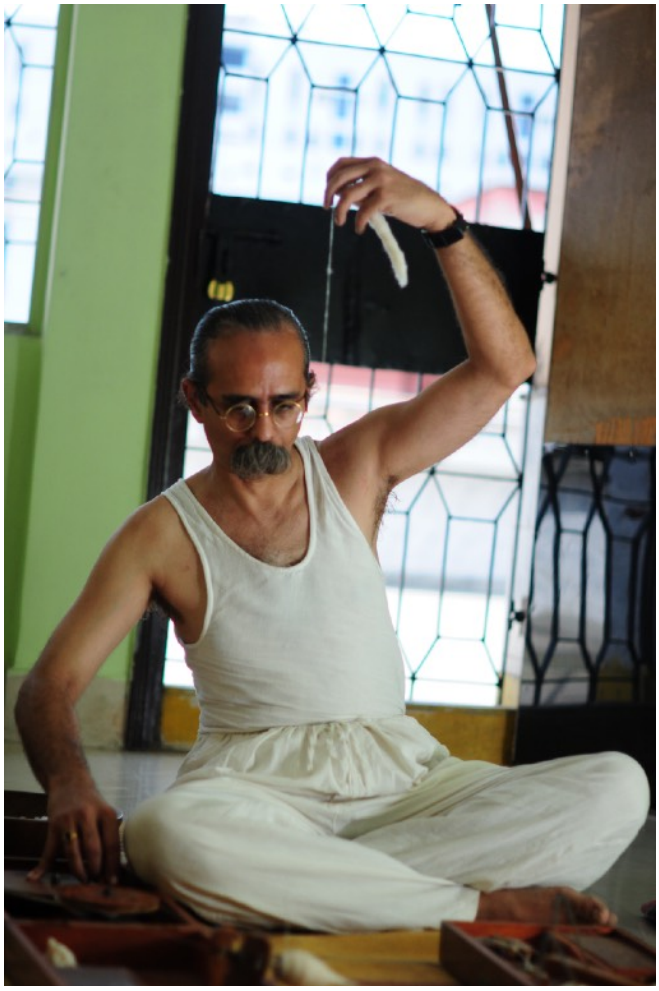

ক্লাস নাইন থেকে আমি খাদির জামা – কাপড় পরতে শুরু করি। স্কুল ইউনিফর্ম পড়তাম না। গান্ধীজি চরকাকে রাজনৈতিক প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। আমি মনে করি চরকা এখন পরিবেশ সচেতনতার প্রতীক। তুমি যে জিন্স আর টি শার্ট পরেছ, সেটা তৈরি করতে অনেক ইলেকট্রিসিটি পুড়েছে।

ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেলাম। চরকায় সুতো কাটতে শিখলাম।

এটা কি তোমার কাছে এক ধরনের মেডিটেশন ?

একদম তাই। মহাত্মা গান্ধী বলতেন, 'ইফ আই ডিড নট স্পিন, আই উড নট থিংক'। এখন প্রতিদিন ২ ঘন্টা ঘরে চরকা চালাই। একজন গায়ক বা বাদক যেমন রোজ তার সঙ্গীত বা বাদ্যটি নিয়ে রেওয়াজ করে, আমিও তেমনি চরকা নিয়ে রেওয়াজ করি।

তুমি কি জানো এরকম একটি আইন আছে যে আনসেন্সর্ড ফিল্ম ব্যক্তিগত উদ্যোগে একবারই সর্বাধিক ১১জনকে দেখানো যায়? তাহলে রেঞ্জ আর্ট গ্যালারিতে তোমার ফিল্মের নিয়মিত প্রদর্শনী করা আইনত সম্ভব নয়। সেই জন্যই দুদিন দেখানোর পর শো বন্ধ করতে হয়।

হ্যাঁ, আইন আছে। কিন্তু আরও একটা কথা আছে। ফিল্মটা যদি একটা আর্ট ওয়ার্ক হিসেবে দেখানো হয়, তাহলে সেন্সরের প্রশ্নটি এড়ানো যায়। আমার কাজ সব সময় আর্ট স্ক্রিনিং হিসেবেই দেখানো হয়, ফিল্ম হিসেবে নয়। সিনেম্যাটোগ্রাফি অ্যাক্টে ফিল্মের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, সেটা একটি ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা, তার সঙ্গে লাভ – ক্ষতি জড়িয়ে আছে। আমার কাজটা তো তা নয়। আমার কাজটা ভিডিও আর্ট / ফিল্ম আর্ট , তাহলে ওই সংজ্ঞা আমার ক্ষেত্রে খাটে না। আমি ফ্রি তে মানুষকে আমার কাজটা দেখাচ্ছি। একটা শো সর্বাধিক ৪০ জন দেখতে পারে। পুরো আইনটাতে পরিস্কার করে কিছু বলা নেই। রাষ্ট্র যখন খুশি এটা বন্ধ করে দিতে পারেতাই তো এখন অমল পালেকর সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টা ফেলেছে, যাতে আইনে স্পষ্ট করে সব কিছু বলা হোক। রেঞ্জ গ্যালরিতে যেত হল সেটার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় আমরা এখন এমন একটা আবহাওয়ার মধ্যে রয়েছি যেখানে একটা মহাভয় ছেয়ে আছে চারপাশে। এবার টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাংবাদিক লিখল যে আমি সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে তাই আমি এই ভাবে ফিল্মটা দেখাচ্ছি। এটা পড়ে গ্যালারির মালিক ভয় পেল। যদি পুলিশ ওর গ্যালারি বন্ধ করে দেয়। কোর্টে কেস করে। এছাড়া বাড়ির মালিকের সঙ্গেও গ্যালারির মালিকের নানা সমস্যা চলছে। এইসব ঝামেলায় আমার কাজটা দেখানো বন্ধ হল। এবার বাড়ির মালিক এমন ঝামেলা করছে যে গ্যালারিটাও এখন বন্ধ আছে।

তোমার প্রথম ছবি আর 'কল্কিমন্থনকথা'য় নগ্নতা এসেছে। তোমার একটি ফিল্মের চিত্রনাট্য নিয়ে কথা হচ্ছিল সেখানেও নগ্নতা আছে। নগ্নতায় তুমি কী দেখ?

নগ্নতা শব্দটার এতো অপব্যবহার হয়েছে যে এটা নিয়ে দীর্ঘ কথা বলতে হয়। সংক্ষেপে বলি, সিনেমাতে যখন ন্যুডিটি দেখি, সেটা একটা ইরোটিক বডি। হয় সে সেক্স করছে বা সবেমাত্র কপুলেশন শেষ করেছে বা শুরু করতে যাচ্ছে। আমি যে জায়গা থেকে আসছি, সেটা হল নগ্নতার প্রাগাধুনিক ধারণা। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে যে নগ্ন শরীর আমরা দেখি, সেটা কখনই সেক্সুয়াল বডি নয়, সেটা ডিভাইন বডি। 'কল্কিমন্থনকথা' তে যে নগ্নতা দেখিয়েছি তা ওই ডিভাইন বডির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। কুম্ভমেলার প্রেক্ষিতে পুরো ফিল্মটা শুট করা যে কুম্ভতে নগ্নতা কখনই নিষিদ্ধ নয়। অনেক সম্প্রদায়ের

সাধুরা সেখানে নগ্ন হয়েই স্নান করেন। এর হল ডিভাইন এসেটিক ন্যুড। কেউ যদি সেটা সেক্সুয়াল বডি হিসেবে দেখে সেটা তার দেখার দোষ। 'কল্কিমন্থনকথা' তে দুই চরিত্র যখন নিজের পরনের কাপড় খুলে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে, ওরা তখন এসেটিক হয়ে যাচ্ছে। আর একটা কথা আছে, আর এক ধরনের ন্যুড বডিকে আমি বলি বহুব্যবহৃত শরীর। মিশেল ফুকো যেমন বলেছেন, যে ভিক্টোরিয়ান ইউরোপ এই ধারণা তৈরি করেছে যে ন্যুড মানেই সেক্সুয়াল। আমাদের দেশেও এই ধারণা আছে। তো যে কথা বলছিলাম, আমি নগ্নতাকে ডিভাইন এসেটিক ন্যুড হিসেবেই দেখি।

এই ফিলমে স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো'র ছায়া আছে। সেটা কেন ?

ছায়া নয়,এটা বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো'কেই অন্যভাবে দেখা। বেকেটের লেখার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের একটা সম্পর্ক। ২০০০ সালে আমি হিন্দিতে একটা শর্ট ফিল্ম করেছিলাম, নাম 'অন্তরা'। অতা বেকেটের একটা নাটক। মাত্র ১৮ লাইনের ডায়ালগেই নাটক শেষ। এটা নিয়ে একটা ২০ মিনিটের সিনেমা হয়েছে। এর আগে কলেজে আমি বেকেটের নাটক অভিনয় করেছি। আমার মনে হয়, আমরা এখন এমন একটা অ্যাবসার্ড সময়ে ঢুকে পড়েছি যে বেকেটকেই আমাদের এখন সবচেয়ে প্রয়োজন। যেখানে কোনও লজিক নেই। বেকেট এই নাটকটা ভেবেছিলেন যখন তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে ফ্যাসি বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। আমাদের দেশ হল এমন একটি দেশ, যেখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় 'ওয়েটিং ফর গোডো' অভিনীত হয়েছে। আমি 'ওয়েটিং ফর গোডো' ইংরেজি, মারাঠি আর হিন্দিতে দেখেছি। 'কল্কিমন্থনকথা' দুটি বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এক, 'ওয়েটিং ফর গোডো' দুই, কুম্ভমেলা। 'কল্কিমন্থনকথা' তে আমি বেকেটের নাটকটাকে একটা স্প্রিং বোর্ড হিসেবে ব্যবহার

করেছি অ্যাডাপ্টেশন করিনি। ৫০% ফিল্মটা আমি জানতাম, বাকিটা জানতাম না। একটা ১৬ মিমি ক্যামেরা আর ৩০টা ফিল্মের ক্যান নিয়ে চলে গেলাম। খুবই ঝুঁকি নিয়েছিলাম।

তুমি যে কল্কীর রূপকটি ফিলমে এনেছ সেটি তো ঘোর হিন্দুব্রাহ্মণ্যবাদী। পুরাণ অনুযায়ী বিষ্ণুর শেষ বা দশম অবতার হলেন কল্কী। যিনি এসে কলিযুগকে বিনাশ করে সত্যযুগ স্থাপন করবেন। তিনি আসবেন ডানাওয়ালা সাদা ঘোড়ায় চেপে। এক হাতে জ্বলন্ত ধুমকেতুর মতো তলোয়ার আর অন্য হাতে চক্র। তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপনের জন্য ম্লেচ্ছ ও বিধর্মীদের নির্মূল করবেন। এতো আর এস এস – এর প্রোগ্রাম!

তুমি একই সঙ্গে ঠিক এবং ভুল। কল্কি অবতার কিন্তু বৈষ্ণব ইতিহাসে একজন বিতর্কিত অবতার। দশ অবতার প্রথম আমরা দেখি মহাভারতে। দশ অবতার বিখ্যাত হয় ভাগবত পুরাণে। যেটা খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা। প্রথম যে দশ অবতারের তালিকা আমরা পাই, তাতে কল্কি অবতার নেই। কল্কি আসেন মধ্যযুগে, মুসলমান আক্রমণের পর। দশ অবতারের এরকম কোনো স্থায়ী তালিকা কোনদিন ছিল না। পরে তো বুদ্ধকেও এই তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন কোনো কোনো তালিকায় পরশুরাম অবতার নেই। কোথাও মোহিনীকে স্থান দেওয়া হচ্ছে, কোথাও মোহিনীকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এই পুরো জিনিসটাই চলমান এবং পরিবর্তনশীল। রামায়ণেরই কতগুলো সংস্করণ পাওয়া যায়। বাল্মীকি, তুলসীদাস আর কৃত্তিবাস – এঁদের রামায়ণই আলাদা আলাদা। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রথম হাজার বছরে আমরা কল্কি অবতারের কোনো উল্লেখই পাই না। সেই তুলনায় কল্কি অনেক আধুনিক বলা যায়। কল্কি আসেনি এখনো। আসবে। যেমন গোডো আসেনি এখনো। আসবে। কল্কি একমাত্র অবতার যে আসেনি। তুমি আর এস এস – এর রেফারেন্স দিলে। কিন্তু মনে রেখো আর এস এস কিন্তু মূলত বৈষ্ণবদের সংগঠন। এই হিন্দুত্ব শৈব নয়, শাক্তও নয়। সাভারকর বা হিন্দু মহাসভা যারা আর এস এস তৈরি করেছিল, তারা ছিল মারাঠি চিৎ পাবন ব্রাহ্মণ। এই বৈষ্ণবরাই কিন্তু হিন্দুত্বকে শাসন করছে। ব্রিটিশরাও এই বৈষ্ণব হিন্দুত্ব চেয়েছিল, যেখানে শাক্ত ও শৈবের কোনও স্থান নেই। আজকের হিন্দুত্বর দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে এটা জৈন আর বৈষ্ণবদের সমন্বিত একটি ধর্ম। যা আমি মনে করি অসম্পূর্ণ হিন্দুত্ব। এই যে নিরামিষ খাবার নিয়ে উন্মাদনা শুরু হয়েছে এটা জৈনদের জন্য। তাই তোমার উত্তরে বলি যে,না,'কল্কিমন্থনকথা' এই তত্ত্ব বলে না।

তোমার ফিল্মগুলো এক একটা দার্শনিক ডিসকোর্স। এরকম ফিল্ম কর কেন ?

ডিসকোর্স কিনা বলতে পারব না, সেটা দর্শক বলবে। আমার ফিল্মগুলো হল ইংরেজি বুদ্ধিবৃত্তি আর বাংলা ভালবাসার ফসল। সিনেমা বহুদিন ধরে একটা কাহিনিভিত্তিক আর্ট ফর্ম হয়ে আছে। যে কাহিনির জন্ম হয়েছিল উনিশ শতকে, ইউরোপে। বাংলায় সিনেমা আজও সেই কাহিনিভিত্তিক আর্ট ফর্ম হয়ে আছে। এই যে লালদার(সুমন মুখোপাধ্যায়) ফিল্ম 'অসমাপ্ত' রিলিজ হল এই মাসে। সেটাও উপন্যাসকে ভিত্তি করে।কিন্তু ফিল্মের তো একটা আলাদা ভাষা আছে। সেটা কে চর্চা করবে ? আমার ফিল্মে সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার ফিল্মে সময়টা সামনে থাকে আর একটা ন্যারেটিভ পিছনে চলে। দিস ইজ আ পলিটিক্স

অফ টেম্পোরালিটি। এই খেলাটা গোদার খেলেছে, ব্রেসোঁ খেলেছে বা তারকভস্কি, আন্তোনিয়নি,অ্যান্জেলেওপুলুস খেলেছে। আর একজন আমাকে ভীষণ ইনফ্লুয়েন্স করে, সে হল ঋত্বিক ঘটক। উনি ন্যারেটিভকে টেম্পোরালে নিয়ে গিয়ে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছেন। আর বলতে হবে মণি কাউলের কথা, ওর ফিল্মেও টাইম যেভাবে ন্যারেটিভ হয়ে ওঠে সেটা আমাকে আকর্ষণ করে। অমিতাভ চক্রবর্তীর 'কাল অভিরতি' আমার প্রিয় ফিল্মগুলোর অন্যতম। কমল স্বরূপ – এর 'ওম দরবদর' – এর কথাও বলতে হয়। আমি বলব আমার ফিল্ম ডিসকোর্স নয় ডিসকার্সিভ। আমি এরকমই ফিল্ম করি। অনেকের বুঝতে অসুবিধে হয়, সে জন্য আমি দুঃখিত ।